যুগান্তর

তারিখ ... 14 MAY 2008
পৃষ্ঠা ... ২৬ কলাম ... ৫

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রিস্টাইল দুর্নীতি

মুসতাক আহমদ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত দুর্নীতি, অনিয়ম আর কেলেংকারির চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। মাত্র ১৫ দিনে ৫২ হাজার খাতা মূল্যায়ন, ২০ নম্বরের মধ্যে ২১ প্রদান, ১৭ নম্বরকে ১৯ বানানো, গবেষণার নামে অর্থ আত্মসাৎ, অবৈধভাবে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ, বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে কমার্স বা ভাষা ও সাহিত্য কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে ভূগোল খাতা মূল্যায়ন, স্ত্রী, শ্যালক ও পিয়ন দিয়ে খাতা মূল্যায়ন, এমনকি খাতা মূল্যায়ন না করেই নম্বর প্রদানের মতো ভয়াবহ ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টির ৯৮ শিক্ষকের মধ্যে ৭২ জনের বিরুদ্ধে উত্তরপত্র 'মূল্যায়ন ব্যবসা'র এ ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে। এদের মধ্যে ইতিমধ্যে ১১ জনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করেছে। সূত্র জানায়, বিষয়গুলো ইতিমধ্যে বিভিন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু শাস্তির সুপারিশ করা সত্ত্বেও কেউই শাস্তিপ্রাপ্ত হয় না। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আরআইএম আমিনুর রশিদ বুধবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে বলেন, 'আমি এ মুহূর্তে এসব বিষয়ে প্রাপ্ত কাগজপত্রই বসে বসে দেখছি। অভিযোগ খুবই ভয়াবহ। ঘটনাগুলো পুরোপুরি ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার মতো।' তিনি বলেন, '১১ জনের ব্যাপারে কাজ চলছে। বাকিদের ব্যাপারেও অভিযোগ আসছে। কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না।' উপাচার্য এ ব্যাপারে শনিবার জরুরি সিন্ডিকেট সভা আহ্বানের কথা জানিয়ে বলেন, প্রয়োজনে ওইদিন ফের তদন্ত কমিটি

দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

দুর্নীতি : ফ্রিস্টাইলে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

গঠন করা হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, বিষয়গুলো সম্পর্কে তারা অবগত। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিগগিরই পদক্ষেপ নেয়া হবে।

যুগান্তর সূত্র জানিয়েছে, ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এসব দিকে চমকানো দুর্নীতি আর অনিয়ম চলে আসছে। বেশিরভাগ শিক্ষক ও কর্মকর্তা এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় এতদিন তা প্রকাশ পায়নি। সম্প্রতি একটি অংশের বিরুদ্ধে আরেকটি অংশ তথ্য ফাঁস করে। ফলে গোটা বিষয়টিই এখন উপাচার্যসহ সরকারের বিভিন্ন দফতরে পৌঁছে গেছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুলের ২০০২ সালের এসএসসি পরীক্ষা ও ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞান ও গণিতের খাতা মূল্যায়ন করেছেন পরীক্ষকের অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমএ রাজ্জাকের আমলে বিজ্ঞানের ১৬২১টি ও গণিতের ২১১০টি খাতা মূল্যায়ন করেন তারই দফতরের সেকশন অফিসার কামরুজ্জামান। ওই বছরই ওয়ার্ড প্রসেসিং অপারেটর জাকির হোসেন বিজ্ঞানের ২৭৪০টি ও গণিতের ২৪০৬টি খাতাও মূল্যায়ন করেছেন। এছাড়া, গণিতের শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও আনোয়ারুল ইসলাম ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১ ও ২০০২ সালের হিসাবরক্ষণ ও কারবার পদ্ধতির উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। এছাড়া তিনি ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষার ৭৯১৫টি ও ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৮২৩৫টি ইংরেজি (প্রথম-৭৪২৫ ও দ্বিতীয় পত্র-৮১০) খাতা মূল্যায়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী বছরে একজন শিক্ষকের ৭ হাজার ৫শ' উত্তরপত্র মূল্যায়নের কথা থাকলে ওই শিক্ষক নিয়ম ভঙ্গ করে ২০০০ ও ২০০১ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ৪৫ হাজার খাতা মূল্যায়ন করেছেন। ওপেন স্কুলের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক আসম রিপন রউফ ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ও গণিত বিভাগের খাতা মূল্যায়ন করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজ বিষয় ইংরেজির ৩০০ উত্তরপত্র মূল্যায়নের কথা থাকলেও তিনি ২২ হাজার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। এছাড়া তিনি ২০০০ ও ২০০১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজির ৮৪৫০টি ও ২০০১ সালে ১৮,৩৩২টিসহ ২৬৭৮২টি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। ওপেন স্কুলের শিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান সবসময় উত্তরপত্র মূল্যায়ন না করেই খাতা বিক্রি করে দিয়ে গড় নম্বর দিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তিনি উত্তরপত্র মূল্যায়ন না করেই মনগড়া নম্বর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, এসব খাতা মূল্যায়ন না করেই তিনি বস্তায় ভরে ঢাকার বাইরে বিক্রি করে দেন। এছাড়া তিনি পরীক্ষার্থীদের নম্বর জমা দেয়ার আগে কখনোই প্রধান পরীক্ষকের স্বাক্ষর নেননি বলেও অভিযোগ রয়েছে। মোঃ আবদুর রহীম ওপেন স্কুলের ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষক হয়েও ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষার ইতিহাস বিভাগের ও ২০০২ সালের বাংলা বিভাগের পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া ২০০৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ইসলামের ইতিহাস বিভাগের উত্তরপত্র না দেখেই গড় নম্বর জমা দিয়েছেন। বিষয়টির প্রমাণ হিসেবে উত্তরপত্রে তার স্বাক্ষর না থাকা বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে, তিনি অনেক ক্ষেত্রে বউ এবং শ্যালক দ্বারাও খাতা দেখিয়েছেন। ওপেন স্কুলের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক ড. নাসিরুল ইসলাম ২০০২ সাল থেকে তার বিভাগের বাইরে ইংরেজি, গণিত, কৃষি শিক্ষা এমনকি অর্থনীতি বিভাগের পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক হিসেবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। এভাবেই পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের অনিয়মের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই অন্যান্য শাখাগুলোও। স্কুল অব এডুকেশনের অধ্যাপক মনিরা হোসেন পদার্থ বিভাগের শিক্ষক হয়েও বিএড প্রোগ্রামের উচ্চতর ভাষা ও সাহিত্য এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া রসায়ন বিভাগের শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম ও গণিতের আমিরুল ইসলাম বিএড প্রোগ্রামের উচ্চতর ভাষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী একই সঙ্গে বিএড/বিএস পরীক্ষার পাঁচটি বিভাগের পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। যা নিয়ম ও নৈতিকতার চরম লংঘন বলে তদন্ত কমিটি মন্তব্য করেছে। এছাড়া এসএসএইচএল'র সিভিক এডুকেশন-১ এবং সিভিল এডুকেশন-২'র বিএ/বিএসএস (পরীক্ষা ২০০৬) বিষয়ের বাইরে ১০ জন শিক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। এর মধ্যে স্কুল অব ল'র সহযোগী অধ্যাপক শহীদ আহমেদ চৌধুরী বাংলা বিভাগের শিক্ষক হয়েও অন্য বিভাগের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। এছাড়া সাবেক ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আনসারুজ্জামান বিষয়ের বাইরে ৫১৮টি, আরবি বিভাগের ড. আমির হোসেন সরকার এসএসএইচএল ডিন ও ওই পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ৬১৫টি, অর্থনীতি বিভাগের মোঃ জাহাঙ্গীর ৫১৯টি, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ফারজানা হোসেন ৫০৪টি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন।

সবচেয়ে বেশি কেলেংকারি হচ্ছে নম্বর প্রদানে। ২০ নম্বরের পরীক্ষায় এক শিক্ষার্থীকে ২১ নম্বর দেয়া হয়েছে! ওই একই পরীক্ষায় অন্তত ৫ শিক্ষার্থীর নম্বর টেম্পারিং করে ১৭ থেকে বাড়িয়ে ১৯ দেয়ার প্রমাণও মিলেছে। আর এ অপকর্মের সঙ্গে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সফিকুল আলমের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এর আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষায় একইভাবে ৫০ নম্বরের মধ্যে ৫৩ নম্বর দেয়ার ঘটনা ঘটেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী বছরে ৫শ'র বেশি খাতা দেখার নিয়ম না থাকলেও যাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে হাজার হাজার খাতা দেখে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন— মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী (১২০৯টি), ড. সেলিনা আক্তার জাহান (১৫১৩টি), এসএম রেজাউল করিম (১৮২৭টি), সাবিনা ইয়াসমিন (১২৯৭টি), মোতাহারুল ইসলাম (১৮৪৮টি), নাজনীন জাহান (১৬১৮টি), তাসরুন জাহান (৯১২টি), কামাল উদ্দিন (২৩৭১টি), হুমায়ুন কবীর (১৭৯৯টি), আমির হোসেন সরকার (১২৪৫টি) (তিনি নিজে তদন্ত কমিটির সদস্যও), ড. জাহাঙ্গীর আলম (২৪৫৮টি), ড. শোয়াইব জিবরান (৯১১টি), তানভীর আহসান (১৮১৭টি), মোঃ আনিছুর রহমান (১২২৭টি), সুনিল কান্তি দে (২৪৫০টি), শাহীন মাহফুজ (৯০৮টি), খাজা জাকারিয়া আহমেদ চিশতী (৯১৫টি), (তিনি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক), ড. আমিরুল ইসলাম (৬৪৫টি), রিপন রউফ (১৩৯০টি), আমিরুল ইসলাম-এডুকেশন (৫৯৯টি), আইরিন পারভীন (৫৯৮টি), প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, সাবেক এড প্রো-ভিসি (১৮৬৬টি), আনোয়ারুল ইসলাম-গণিত (২৫৩৩টি), ড. নাসিরুল ইসলাম (২১০৬টি), ড. জুবায়দা আক্তার (১১৯৯টি), সাদিয়া সুলতানা (১৮৬৩টি), জাফর আহমেদ (২৪২৮টি), মাসুদ পারভেজ (১৮১১টি), মিজানুর রহমান (১২০৭টি), শিরিন সুলতানা (২০২১টি), ড. মোঃ আবদুর রশিদ (২৪১০টি), মনিরা জাহান (৮০২টি), গোলাম মোর্তুজা (৯৪৪টি), আনোয়ারুল ইসলাম-রসায়ন (১৪৯১টি), সুফিয়া বেগম (১৫২৬টি), কাজী গালিব আহসান (১১৫৪টি), শফিউল আলম (১১৬৮টি), আবু তালেব (১২১৩টি), কেএম রেজানুর রহমান (৯৯০টি), ড. হাবিবুর রহমান (২১০০টি), ড. রফিকুল ইসলাম (১৩০০টি), ফারজানা হোসেন (১১৩৮টি), শহীদ আহমেদ চৌধুরী (৮০০টি), মামুনুর রশিদ (৯১৮টি) প্রমুখ। এরা কয়েকজনের মাত্র ১ বছরের ১টি প্রোগ্রামের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। ৯৮ শিক্ষকের মধ্যে এ ৭২ জনই উত্তরপত্র মূল্যায়ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। যা বিভিন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রমাণিতও হয়েছে।